আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী -৪

অভিজিৎ রায়
www.mukto-mona.com

পাঠকদের অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে ই-মেইল করে এই সিরিজটির প্রতি তাঁদের আগ্রহ আর ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন; তাঁদের কথা মনে রেখেই এটিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অভিজিৎ
৯/৭/২০০৩

পূর্ববর্তী পর্বের পর হতে...

অ্যারিস্টটলের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে একটি সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের বিশ্বজগৎ কে দেখবার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার উত্তোরণ ঘটাতে আক্ষরিক অর্থেই মানুষের হাজার বছর সময় লেগেছে। তারপর থেকে মহাকাশ নিয়ে অন্তহীন কৌতুহল তো মানুষের কমেনি - বরং বেড়েই চলেছে ক্রমাগত। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ - এই দশকটা পদার্থবিদ আর জ্যোতির্পদার্থবিদদের জন্য স্বর্ণ-দশক বলা যেতে পারে। তাঁদের হাত দিয়েই মূলতঃ এই সময় পদার্থবিদ্যার এক নতুন শাখা -কোয়ান্টাম বল-বিদ্যার জন্ম হয় । আর আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বপ্রকাশের পর থেকেই জ্যোতির্পদার্থবিদের মধ্যে প্রকৃতি আর মহাকাশকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করার যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে তাঁদের মনে উঠে আসছিল - 'কত বড় আমাদের এই বিশ্ব জগৎ? এর বয়সই বা কত?'; 'কিভাবে তৈরী হয়েছিল বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রাথমিক উপাদান গুলো?', 'কি ভাবে পদার্থ সমূহ এই মহাবিশ্বে ছড়ানো?'; আর 'শেষ পর্যন্ত এই মহাবিশ্বের পরিনতিই বা কি হবে?'- এ ধরনের আকর্ষনীয় অথচ অন্তিম প্রশ্ন গুলো। আসলে এই প্রশ্ন গুলো যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে - তার কেন্দ্রে রয়েছে আমাদের এই প্রসারমাণ বিশ্বের (Expanding Universe) ধারণা। ব্যাপারটিকে ভাল মত আত্মস্থ করলেই কেবল অন্তিম প্রশ্নগুলোকে বুঝবার মত পরিস্থিতিতে যাওয়া সম্ভব।

মহাবিশ্বের প্রসারণ নিয়ে কথা শুরু করবার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে পাঠকদের অবহিত করা প্রয়োজন। পদার্থবিদ্যার স্বর্ণযুগ বলে যে সময়টাকে অভিহিত করেছি সে সময়টাতে শুধু পশ্চিমা বিজ্ঞানীরাই অবদান রেখেছেন তা কিন্তু নয়। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীরাও তখন পিছিয়ে ছিলেন না। অন্ততঃ চারটি অবদানের কথা তো বলাই যায় নির্দ্বিধায়- ১) সাহা আয়নীকরণ সূত্র (Saha Ionization Formula in 1920) ২) বোস সংখ্যায়ন (Bose Statistics in 1924) ৩) রমনের ফলাফল (Raman effect in 1928) এবং ৪) চন্দ্রশেখরের সীমা (Chandrashekhar's limit in 1934/35)। এর মধ্যে প্রথম দুজন (মেঘনাদ সাহা এবং সত্যেন বোস) ছিলেন বাঙ্গালী। মেঘনাদ সাহা জন্মেছিলেন বাংলাদেশেই - ঢাকার অদুরে শ্যাওরাতলি গ্রামে। পড়ালেখাও করেছেন বাংলাদেশের গ্রামের স্কুলেই। পড়ালেখার পাশাপাশি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনেও ছিলেন সবসময় সমান সক্রিয়; ছিলেন মুক্তচিন্তা এবং যুক্তিবাদের আমরণ পৃষ্ঠপোষক। আর সত্যেন বোস - কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় তাঁর যে বিখ্যাত অবদান - সেই 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' - তা কিন্তু তিনি চিন্তা করে বের করেছিলেন বাংলাদেশে বসেই - ১৯২৪ সালে যখন তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আজ আমরা যে 'বোসন কণার' নাম শুনি তা কিন্তু পরবর্তীতে এই সত্যেন বোসের নামানুসারেই রাখা হয়েছে হয়েছিল। মূলতঃ সাহা, বোস আর রমণের আবিস্কার তিনটির সূত্রপাত ঘটেছিল আমাদের উপমহাদেশের মাটিতেই। আর চতুর্থ আবিস্কারটি চন্দ্রশেখরের - ইংল্যান্ডের মাটিতে। চন্দ্রশেখরের আবিস্কারটি সম্বন্ধে এখানে সঙ্গত কারণেই একটু বিস্তারিত আলোচনা করব কারণ আমাদের প্রবন্ধের পরবর্তী অংশের সাথে এর ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে।

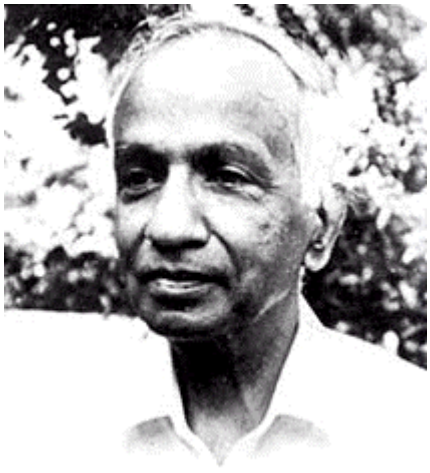

সুব্রামনিয়াম চন্দ্রশেখর (১৯১০-১৯৯৪)

চন্দ্রশেখর যখন কেমব্রিজে পি.এইচ.ডি করছিলেন সেসময় ইউরোপ আর আমেরিকার বিজ্ঞানীরা তারার উৎপত্তি আর বিনাশ নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। একটি তারা যখন তার জীবনকালের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছায়, তখন এর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা হঠাৎ বাড়তে থাকে অবিশ্বাস্য গতিতে। এই তাপমাত্রার প্রভাবে অব্যবহৃত হাইড্রোজেন পরিবর্তিত হয়ে হিলিয়ামে পরিণত হয়।

অবশেষে অভ্যন্তরের তাপমাত্রা যখন প্রায় ১০ কোটি ডিগ্রী কেলভিনে পৌঁছায়, তখন নতুন এক ধরনের ফিউশন প্রক্রিয়া চালু হয়ে তা হিলিয়াম পরমানুর নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে কার্বনে পরিনত করে। এই পুরো প্রক্রিয়াকে বলে 'ট্রিপল-আলফা' বিক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি তারা আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে পরিনত হয় লোহিত দৈত্যে (Red Giant)। আমাদের সূর্য ও প্রায় এক হাজার কোটি বছর পরে এমনি একটি লোহিত দৈত্যে পরিনত হবে। যখন এরকম একটি তারার সমস্ত জ্বালানী নিঃশেষিত হয়ে আসে, নিজস্ব ভরের কারণে সৃষ্ট মাধ্যাকর্ষনের প্রভাবে সেটি তখন প্রবলভাবে সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। অবশেষে এর আকার ছোট হয়ে আমাদের পৃথিবীর সমান আকারের তারায় পরিণত হয়, কিন্তু এর ঘনত্ব বেড়ে দারায় প্রায় একশ কোটি কিলোগ্রাম পার ঘন মিটারের মতন। তারার এই পরিনতিকে বলে শ্বেতবামন (White Dwarf)। সাধারণ তারার সাথে শ্বেত বামনের পার্থক্যটা হল সাধারণ তারার ভর বাড়ার সাথে সাথে এটি আয়তনেও বাড়তে থাকে, কিন্তু শ্বেত বামনদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উলটা। ভর বাড়ার সাথে সাথে এটি না বেড়ে বরং আরও সংকুচিত হতে থাকে। নীচের ছবিটা দেখলে হয়ত পাঠকদের কাছে ব্যাপারটা পরিস্কার হবে। লক্ষ্যনীয় যে, ভর বাড়তে বাড়তে এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যখন তারার ব্যাসার্ধ (আয়তন) কমে আক্ষরিক অর্থেই শুন্য হয়ে যায়।

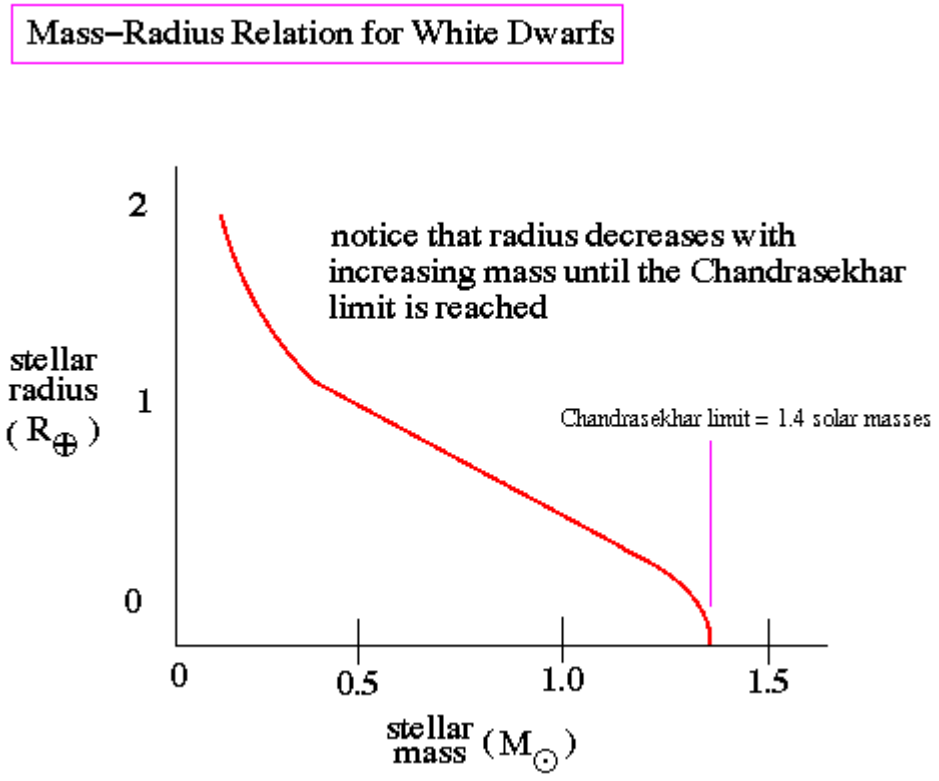

আসলে ১৯৩০ সালের আগে অধিকাংশ বিজ্ঞানীদেরই ধারণা ছিল, সব তারাই বোধ হয় এমনি ভাবে শেষ পর্যন্ত জ্বালানী নিঃশেষ করে শ্বেত বামনে রূপ নেয়। কিন্তু চন্দ্রশেখর বললেন - না, সব তারা নয়। যে সমস্ত তারার ভর সূর্যের ১.১৪ গুনের (এটাই বিখ্যাত চন্দ্রশেখরের সীমা) বেশী, তারা কিন্তু কখনই ওইরকমভাবে শ্বেত বামনে পরিনত হবে না । এ ধরনের তারারা যখন জ্বালানী নিঃশেষ করে তাদের জীবনকালের প্রান্ত সীমায় এসে পৌঁছায়, তখন ভয়ঙ্কর এক সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে বাইরের স্তরটি ভেঙ্গেচুরে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে আর ভিতরটা সংকুচিত হয়ে একসময় শ্বেত বামনের চেয়েও ঘন এক ধরনের বস্তুতে পরিনত হয় -যাকে বলা হয় 'নিউট্রন তারা'। সত্যি বলতে কি, সূর্যের চেয়ে ১.১৪ গুন বড় সব তারাই যে এরকম নিউট্রন তারায় পরিনত হয় তাও নয়। এরও একটা সীমা আছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে, যে সমস্ত তারারা সূর্যের চেয়ে ১.১৪ থেকে ৩ গুন ভারী, শুধু সে সমস্ত তারাই কেবল নিউট্রন তারায় পরিনত হয়, কিন্তু এর চাইতে ভারী তারারা প্রচন্ড মাধ্যাকর্ষনের টানে ভেঙ্গে পড়তে পড়তে এমন অবস্থায় চলে আসে যখন এর ঘনত্ব হয়ে যায় অসীম; এমনই ঘন যে এর মাধ্যাকর্ষন শক্তিকে উপেক্ষা করে আলো পর্যন্ত পালাতে পারে না। আলো প্রতিফলিত না হওয়ায় আক্ষরিক অর্থেই এই নভোজাগতিক বস্তুগুলো আমাদের চোখে থেকে যায় অদৃশ্য। এরাই কিন্তু বহুল প্রচারিত 'কৃষ্ণ গহবর' বা Black Hole।

এই তত্ত্বকথা গুলো বিজ্ঞানীদের জানা ছিল অনেক আগে থেকেই। তবে এই তত্ত্ব কথার প্রমাণ পেতে সময় লেগেছে। ১৯৬৭ সালে জোসলিন বেল আর অ্যান্টনী হিউয়িশ মহাকাশে খুঁজে পেলেন এক নতুন ধরনের তারা। সাধারণ তারাদের মূল উপাদান হল ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। কিন্তু নতুন এ তারাদের পুরোটাই ছিল নিউট্রন। তাই এরা নিউট্রন তারা।

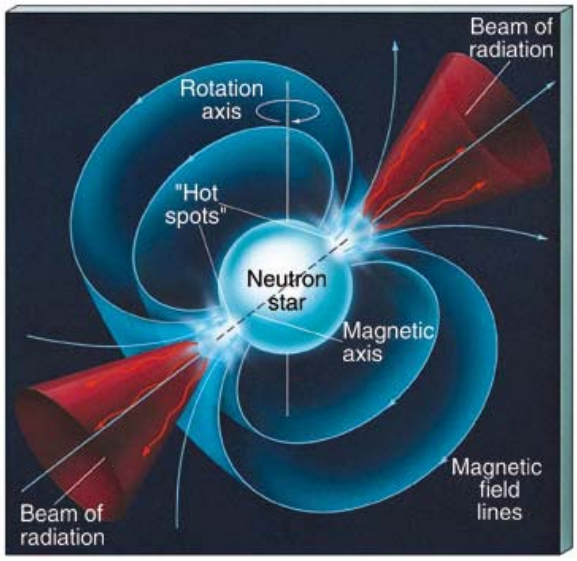

নিউট্রন তারা (লাইট হাউজ মডেল)

নিউট্রন তারার অস্তিত্বের তত্ত্বকথাগুলো তো তাদের আগেই জানা ছিলই। কাজেই বুঝতে তেমন অসুবিধা হল না। কিন্তু কথা হচ্ছে - এই দু'বিজ্ঞানী তারার খোঁজটা পেলেন কিভাবে? পাওয়াটা কষ্টকর, কারণ আমরা তো আগেই জেনেছি যে, নিউট্রন তারা হচ্ছে তারার প্রায় অন্তিম দশা - একেবারে যাকে বলে জরাগ্রস্ত দশা। এই জরাগ্রস্ত তারা থেকে আলো বেরোয় না বললেই চলে। তাহলে? আলো না বেরুলেও আরেকটা জিনিস বেরোয় - লম্বা মাপের ঢেউ - রেডিও তরংগ।

জোসলিন বেল
(১৯৪৩-)

এই রেডিও তরংগ সনাক্ত করেই করেই নিউট্রন তারাদের হদিস পেলেন হিউয়িশ আর বেল। নিউট্রন তারা থেকে রেডিও সঙ্কেত কিন্তু নিরবিচ্ছন্ন ভাবে আসে না, হঠাৎ হঠাৎ ঝলক আকারে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়; অনেকটা সমুদ্র সৈকতে সার্চ-লাইটের মত। ঝলকের ইংরেজী হল পালস। তাই এদের নাম দেওয়া হল পালসার। বাংলা করলে আমরা বলতে পারি ঝলক তারা। এই ঝলক তারা আবিস্কার করেই হিউয়িশ নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯৭৪ সালে - কিন্তু জোসলিন বেল পেলেন না। কারণ, জোসলিন বেল ছিলেন হিউয়িশের ছাত্রী।

অনেকেই (যেমন, Sir Frederick Hoyle, Thomas Gold, Jeremiah Ostriker) মনে করেন জোসলিন বেলের প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল সেসময়। বেলকে হিউয়িশের সাথেই যুগপৎ নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিৎ ছিল। তবে বিনয়ী বেল কিন্তু তা মনে করেন না। বেলের নিজের কথাতেই শোনা যাক -

'I believe it would demean Nobel Prizes if they were awarded to research students, except in very exceptional cases, and I do not believe this is one of them. Finally, I am not myself upset about it - after all, I am in good company, am I not!"

নোবেল পুরস্কার কিন্তু অনেকেই সময় মত পাননি। চন্দ্রশেখরের কথাই ধরা যাক। শ্বেত বামনের ক্ষেত্রে তার বিখ্যাত সীমা আবিস্কারের পরও তাকে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। আসলে '৩০ এর দিকে তার বিখ্যাত আবিস্কারের কথা প্রকাশ করে চন্দ্র সে সময় এডিংটনের তোপের মুখে পড়েন। এডিংটন ছিলেন তখন বিলেতের সবচেয়ে নামকরা বিজ্ঞানী। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্ব উনিই পরীক্ষা করে এর সত্যতা যাচাই করেছিলেন। এডিংটনের তখন ধারণা ছিল চন্দ্র আজে বাজে বকছেন। রয়েল অ্যাস্ট্রনমিকাল

সোসাইটির একটা সম্মেলনে এডিংটন তো চন্দ্রকে রীতিমত হাস্যাস্পদ করে তুললেন। অবস্থা এমনই শোচনীয় হয়ে দাড়ালো যে, চন্দ্র এক সময় সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে আমেরিকায় পাড়ি জমালেন। কারণ তিনি বুঝে ছিলেন এডিংটনের দেশে আর যাই হোক কোন ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী পাওয়ার আশা তাঁর নেই। তখন এডিংটনের প্রভাবে আপ্লুত বিজ্ঞানীদের অনেকেই (নিলস বোর, পাউলিরা ছিলেন এ থেকে ব্যতক্রম) চন্দ্রের কথা না মেনে নিলেও পরে কিন্তু সবাই বুঝতে পেরেছিলেন যে এডিংটন নয়, ওই সময় চন্দ্রই আসলে সঠিক ছিলেন। আজ শত শত শ্বেত বামনের অস্তিত্বের কথা আমরা জেনেছি, এর সব গুলোই কিন্তু চন্দ্রের দেখানো নিয়মই অনুসরণ করে - আজ পর্যন্ত একটিও ব্যতিক্রম পাওয়া যায়নি।

এবার আবার একটু পেছনের দিকে যাওয়া যাক। আইনস্টাইনের থিওরী থেকে কিন্তু একটা জিনিস বেরিয়ে আসছিল যে, আমাদের এই মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু আইনস্টাইন নিজেই সেটা বুঝতে পারলেন না। বুঝতে পারলেন না বলাটা আসলে ঠিক হল না - ঠিকভাবে বললে বলা উচিৎ যে - মানতে চাইলেন না। মাধ্যাকর্ষনের প্রভাবে গ্যালাক্সি গুলোর একে অপরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য (মানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে একটা ভারসাম্য দেওয়ার জন্য) আইনস্টাইন তার গানিতিক সমীকরণগুলোতে একটা কাল্পনিক ধ্রুবক যোগ করেছিলেন । এটাই সেই বিখ্যাত 'মহাজাগতিক ধ্রুবক' (Cosmological constant) যার সাহায্যে আইনস্টাইন স্থিতিশীল মহাবিশ্বের মডেলের (যা কিনা প্রসারিতও হয় না, আবার সংকুচিতও হয় না) প্রতি আস্থা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু আইনস্টাইনের আস্থায় অচিরেই চির ধরল।

১৯২৯ সালে এডুইন হাবল (১৮৮৯ - ১৯৫৩) সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন মানমন্দির থেকে বিখ্যাত ১০০ ইঞ্চি টেলিসকোপের (হুকার রিফলেকটর) সাহায্যে দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর দিকে তাকিয়ে বুঝলেন এরা সবাই আসলে একে অপর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে; মানে মহাবিশ্ব স্থিতিশীল নয় - বরং প্রসারিত হচ্ছে।

এডুইন হাবল (১৮৮৯ - ১৯৫৩)

কিভাবে হাবল বুঝলেন ব্যাপারটা? বুঝলেন ডপলারের ক্রিয়া (Doppler Effect) থেকে পাওয়া লোহিত সরণ (Red Shift) প্রত্যক্ষ করে। এই ব্যাপারটা একটু পরিস্কার করা যাক। ধরুন, আপনি একটি রেল স্টশনে দাড়িয়ে আছেন। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আনেক দূর থেকে ট্রেন যখন হুইসেল বাজাতে বাজাতে যতই আপনার দিকে আসতে থাকে, ততই হুইসেলের শব্দ আপনার কানে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হতে থাকে। আর ট্রেন যখন আপনাকে অতিক্রম করে চলে যায় শব্দের তীক্ষ্ণতাও কমতে থাকে। ডপলারের ক্রিয়ার কারণেই এটা হয়। তীক্ষ্ণ শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম হয় মৃদু শব্দের তুলনায়। শব্দের তীক্ষ্ণতা পরিবর্তনের অর্থ আসলে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন। এ তো গেল শব্দের কথা। আলোর ক্ষেত্রে তো আর তীক্ষ্ণ শব্দ কানে আসার ব্যাপার থাকছে না, সেক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা ঘটে তা হচ্ছে রং এর পরিবর্তন।

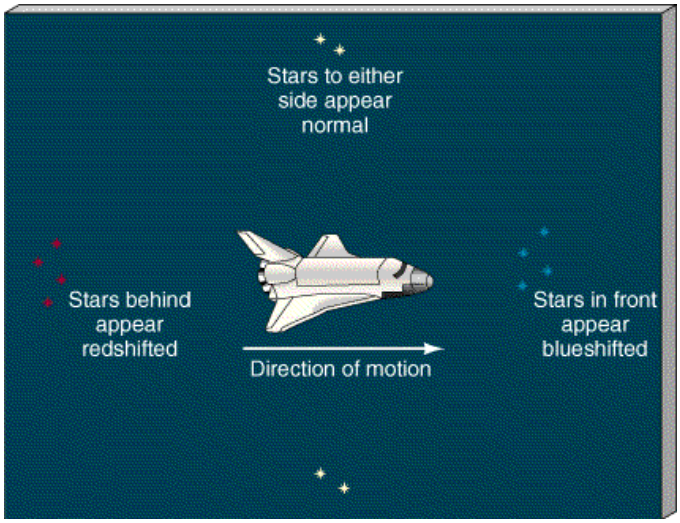

ডপলারের ক্রিয়া

একটা উদাহরণ দেই। ধরা যাক একটা খুব দ্রুতগামী রকেট পৃথিবী থেকে মহাশুণ্যে উৎক্ষিপ্ত হল প্রচন্ড বেগে - যা মোটামুটি আলোর বেগের সাথে তুলনীয়। এখন রকেটের বেগ বাড়াতে থাকলে খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটবে।

রকেটের যাত্রীরা দেখবে যে, সামনের নক্ষত্ররাজি থেকে যে আলো রকেটের দিকে আসছে তা ক্রমশ নীলচে হয়ে উঠছে। সহজ কথায়, রকেটের সামনের দিকের সমস্ত তারাকেই যাত্রীদের চোখে সাধারণ অবস্থার চেয়ে অনেক নীলাভ মনে হবে। রকেটের বেগ যতই বাড়বে রঙ পরিবর্তনের এই ব্যাপারটাও ততই স্পষ্ট হবে। আর রকেটের পেছনের তারারা যাত্রীদের কাছে সাধারণ অবস্থার চেয়ে লালচে হয়ে ধরা পড়বে। আসলে এখানেও রেলগাড়ির শব্দের মত সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যেরই পরিবর্তন। আমাদের চোখে দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী, আর বেগুনী আলোর সবচেয়ে কম। আর অন্যান্য রং এর আলো এই দুই তরঙ্গ সীমার মাঝের অঞ্চল ঘিরে থাকে। রঙের পরিবর্তনের এই জ্ঞানটাই কাজে লাগালেন হাবল।

গ্যালাক্সিগুলোর ক্রমশ লালচে হয়ে যাওয়া (যাকে উপরে লোহিত সরণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে) দেখে হাবল বুঝলেন যে গ্যালাক্সিগুলো আসলে একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সরে যাচ্ছে কিন্তু একটা নিয়মকে অনুসরণ করে - এই দুরে সরে যাওয়ার হার এদের দূরত্বের সমানুপাতিক। মানে, একটা গ্যালাক্সি যদি আরেকটা থেকে দ্বিগুন দূরত্বে থাকে, তাহলে তাদের দুরে সরে যাওয়ার বেগও দ্বিগুন হবে। হাবলের এই আবিস্কারটি কিন্তু এই বিশ শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক উল্লখযোগ্য আবিস্কার। এথেকেই বেরিয়ে আসল যে মহাবিশ্ব আসলে প্রসারণশীল। হাবলের এই আবিস্কারের পর আইনস্টাইন নিজেই ঘোষণা করলেন যে, গানিতিক সমীকরনে মহাজাগতিক ধ্রুবকের আমদানী করে মহাবিশ্বকে স্থিতিশীল করার চেষ্টাটা ছিল তাঁর জীবনের সবচাইতে বড় ভুল (Greatest Blunder)। কিন্তু সত্যিই কি আইনস্টাইন এত বড় ভুল করেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে এই সিরিজের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

মহাবিশ্ব যে প্রসারণশীল তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু কি রকম সেই প্রসারণ? এর কি কোন কেন্দ্র আছে? উত্তর হচ্ছে - না নেই। আমাদের গ্যালাক্সি থেকে হয়ত মনে হতে পারে অন্য সব গ্যালাক্সি যেহেতু আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে (পৃথিবীর বুকে টেলিসকোপ লাগিয়ে দেখলে অন্ততঃ তাই মনে হবে)- আমরাই বোধ হয় এর কেন্দ্রে।

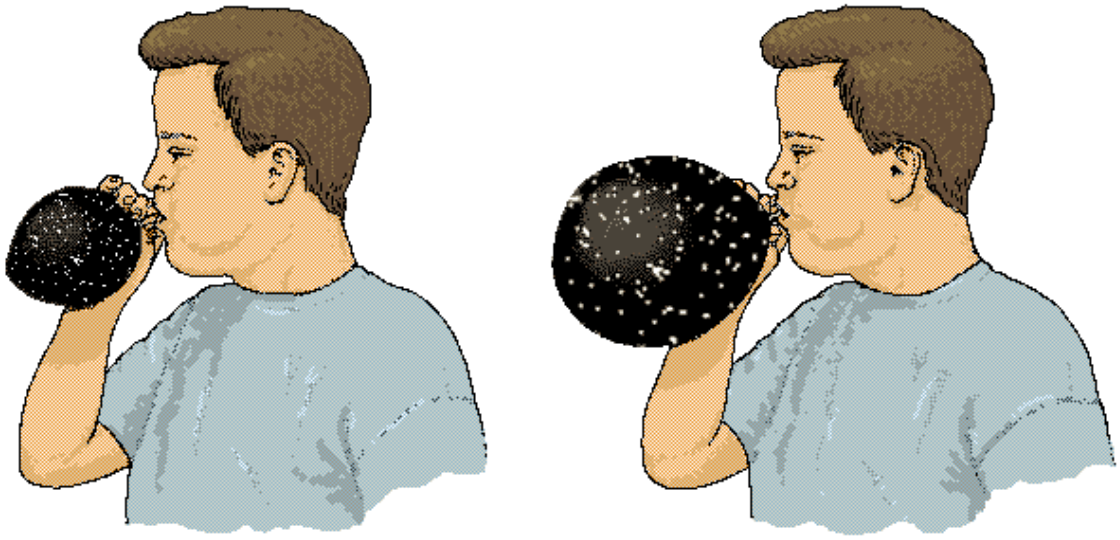

Draw spots on a balloon to represent galaxies in the universe.

As you blow up the balloon, the "galaxies" move further apart.

কিন্তু আসলে তা নয়। এই প্রসারনটা আসলে সম্পূর্ণ সুষম; মানে যে কোন গ্যালাক্সিতে গিয়ে এই পরীক্ষা করলেও একই ফলাফল পাওয়া যাবে - মনে হবে অন্য গ্যালাক্সিগুলো দুরত্বের সমানুপাতিক হারে সেই গ্যালাক্সি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কাজেই কোন গ্যালাক্সিই এই 'মহাবিশ্বের কেন্দ্র' হিসেবে নিজেকে কখনও দাবী করতে

পারে না। ব্যাপারটাকে পাঠকদের কাছে উপরের ছবির ফোলানো বেলুনের উদাহরন দিয়ে আরো ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বেলুনের বাইরের আবরনটাকে মহাশুন্য হিসেবে ভাবা যাক। বেলুনের গায়ে ছোট ছোট গোলাকার কতকগুলো দাগ কেটে সেগুলোকে গ্যালাক্সি বলে ভেবে নেই। এখন ফু দিয়ে যতই বেলুনটাকে ফোলানো হবে, দাগ গুলোর (মানে গ্যালাক্সি গুলোর) মধ্যকার দূরত্ব কিন্তু বাড়তে থাকবে, কিন্তু কোন গ্যালাক্সিই দাবী করতে পারবে না যে সে বেলুনের কেন্দ্রে, কারণ ফোলানো বেলুনের তো কোন কেন্দ্র নেই।

গ্যালাক্সিগুলো যে একে অপরের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, তা দেখে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন যে, অতীতে নিশ্চয়ই এরা খুব কাছাকাছি ছিল আর এ ধারণাও করা বোধ হয় অমূলক হবে না - সৃষ্টির আদিতে তাহলে সব কিছুই খুব ঘন সন্নিবদ্ধ অবস্থায় গাঁট-বন্দী (densely packed) হয়ে ছিল; সেই অবস্থা থেকেই সব কিছু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এটাই বিখ্যাত 'বিগ-ব্যাঙের' ধারণা । এই ধারনা অনুযায়ী এই মহাবিশ্ব প্রায় ১৫০০ কোটি বছর আগে এক মহা-বিস্ফোরনের মাধ্যমে অতিঘন উত্তপ্ত (hot super densed state) আর অসীম ঘনত্বের এক পুঞ্জিভূত অবস্থা (যাকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় অদ্বৈত বিন্দু (Singularity point)) থেকে সৃষ্ট। দেশ কালের ধারণাও এসেছে এই বিগ-ব্যাঙের পর মুহূর্ত থেকেই; কাজেই তার আগে কি ছিল - এই প্রশ্ন বিজ্ঞানের ভাষায় একেবারেই অর্থহীন। আসলে অর্থহীন এ কারণে যে, আমাদের পরিচিত পদার্থবিজ্ঞানের সুত্র দিয়ে ওই অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা এর আগে দেখেছি নিউটনের সূত্রকে আলোর বেগের কাছাকাছি অবস্থায় এসে ভেঙে পড়তে। তেমনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বসহ অন্যান্য যে সূত্রগুলো মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটনে আজ ব্যবহৃত হচ্ছে - সিংগুলারিটি বিন্দুতে গিয়ে সেগুলোও কিন্তু কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রকৃতি জগতের চারটি বল - সবল নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, তড়িচ্চুম্বকিয় বল এবং মাধ্যাকর্ষণ বল এই চারটি বল 'সুপার ফোর্স' হিসেবে একসাথে মিশে ছিল সৃষ্টি শুরুর $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পর্যন্ত। প্রথম এক সেকেন্ড পরে কোয়ার্ক, ইলেকট্রন, প্রোটন নিউট্রনের মত মৌলিক কণাগুলো গঠিত হয়। সৃষ্টির তিন সেকেন্ড পরে প্রোটন আর নিউট্রন মিলে তৈরী হল নিউক্লিয়াস, তার পর হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। কিন্তু সৃষ্টির প্রায় ১ লক্ষ বছর পর্যন্ত আমরা যাকে পদার্থ বলি সেরকম কিছুই তৈরী হয় নি। তখন আসলে একস রে আর রেডিও ওয়েভের মত তেজস্ক্রিয় রশ্মিরাই বরং পদার্থের উপরে রাজত্ব করছিল। নিউক্লিয়াস থেকে অনু-পরমানু আর তার পর মুক্ত ইলেকট্রন তৈরী হতে আসলে আক্ষরিক অর্থেই বিস্তর সময় লেগেছে। আর তার পরই কেবল তেজস্ক্রিয়তার উপর পদার্থের আধিপত্য শুরু হয়েছে। এরপর আরও ২০ কোটি বছর লেগেছে গ্যালাক্সি জাতীয় কিছু তৈরী হতে। আর আমাদের যে গ্যালাক্সি - যাকে আমরা নাম দিয়েছি 'মিল্কিওয়ে' - সেখানে সূর্যের সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে।

আর সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান গ্যাসের চাকতি, ভগ্নস্তুপ থেকে আজ থেকে প্রায় ৪৫০ থেকে ৪৬০ কোটি বছরের মধ্যে তৈরী হয়েছে পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহমন্ডলী।

এই হচ্ছে সাদা-মাঠা ভাবে আমাদের বিশ্বজগৎ সৃষ্টির ইতিকথা। 'সাদা-মাঠা' শব্দটি ইচ্ছে করেই এখানে ব্যবহার করলাম, কারণ, এই আশ্চর্য এই সৃষ্টিরহস্যের (বিশেষ করে প্রথম কয়েক মিনিটে কি ঘটেছিল) পেছনে লুকিয়ে আছে আসলে কতগুলো ধারণা আর ভারী ভারী তত্ত্ব কথা, যার অনেক কিছুই কিন্তু এখনও খুব পরিস্কার নয়। এখানে নানা মুনির নানা মত। তবে অধিকাংশ (সবাই নয়) মুনিই এখন একটি বিষয়ে অন্ততঃ একমত হয়েছেন যে বিগ-ব্যাং বলে একটা কিছু আসলেই ঘটেছিল। কিভাবে বুঝলেন? হাবলের আবিস্কারের কথা তো পাঠকদের আগেই বলা হয়েছে । কিন্তু পাঠকদের অনেকেই নাক সিটকিয়ে বলতে পারেন যে, হাবলের আবিস্কার তো আসলে মহাবিশ্বের প্রসারণের কথাই শুধু বলছে, বিগ-ব্যাঙের তো আর নয়। হ্যা, কথাটা ঠিকই। তবে, হাবলের অবিস্কারের পর বিগ ব্যাঙের পক্ষে সবচেয়ে জোড়ালো সাক্ষ্য পাওয়া গেছে ১৯৬৪ সালে - 'কসমিক ব্যক গ্রাউন্ড রেডিয়েশন' থেকে।

এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে প্রথমে জর্জ গ্যামোর কথা কিছু বলে নিতেই হয়। বিশ্বপিতা অথবা জাতির পিতার মত 'বিগ-ব্যাঙের পিতা' বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে সেই উপাধিটা নিঃসন্দেহে গ্যামোর ঘাড়েই বসবে। রাশিয়ার এই রসিক আর খেয়ালী বিজ্ঞানী (যিনি আবার ছিলেন একজন শখের জাদুকর), প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে একার চেষ্টাতেই বলা যায় বিগ-ব্যাঙের ধারণাকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

জর্জ গ্যামো (১৯০৪-১৯৬৮)

স্ট্যালিনের আমলের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সহ্য করতে না পেরে রাশিয়া থেকে পালিয়ে গ্যামো তখন সবে মাত্র এসেছেন জর্জ ওয়াসিংটন ইউনিভার্সিটিতে। তখন (১৯৪০ সালের দিকে) গ্যামোর অধীনে পি.এইচ.ডি করার জন্য রালফ আলফার নামে একজন মেধাবী গ্রাজুয়েট ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেয়। এসময়ই আলফারের সাথে কাজ করতে গিয়ে বিগব্যাঙের ধারণা প্রথমে গ্যামোর মাথায় আসে। হাবলের প্রাসারণশীল বিশ্বের কথা গ্যামো তো জানতেনই। আরেকটু বাড়তি চিন্তা করে ভাবলেন, যদি তাই হয়, তবে সমস্ত মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই একটি মাত্র বিন্দু থেকে একসময় উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল;

যাকে আমরা এখন বিগ ব্যাং নামে অভিহিত করছি। তবে গ্যামো নিজে কিন্তু এই 'বিগ-ব্যাঙ' শব্দটি প্রথমে ব্যবহার করেন নি। আসলে গ্যামোর ধারণাকে খন্ডন করতে গিয়ে আরেক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্রেড হয়েল (যিনি বিগব্যাং তত্ত্বের বিপরীতে 'Steady State' নামে আরেকটি জনপ্রিয় তত্ত্বের প্রবক্তা) প্রথম 'বিগ ব্যাঙ' শব্দটি ব্যবহার করেন। আর তার পর থেকেই এই শব্দটি ধীরে ধীরে বিজ্ঞানে স্থায়ী আসন করে নেয়। যা হোক, আলফারের পি এইচ ডির শেষ পর্যায়ে, আলফার আর গ্যামো মিলে 'Physical Review' জার্ণালের জন্য 'origin of the chemical elements' নামে একটি পেপার লিখতে শুরু করলেন। আর একখানেই রসিকরাজ গ্যামো বিজ্ঞানের জগতে সবচেয়ে বড় রসিকতাটি করে বসলেন। জার্ণালে পাঠনোর সময় তিনি তাঁর বন্ধু আরেক পদার্থবিদ হ্যানস বেথের (কর্নেল ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক) নাম তাঁকে না জানিয়েই সেই পেপারের লেখক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে দেন। পরে কারণ হিসেবে বলেছিলেন - ''আরে 'আলফার' আর 'গ্যামো' -এই দুই গ্রীক ধরনের নামে র মাঝে 'বেটা' জাতীয় কিছু থাকবে না - এ হয় নাকি? তাই বেথেকে দলে নেওয়া!'' আর সত্যই ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের ১ তারিখে এই তিন বিজ্ঞানীর নামেই কিন্তু পেপারটি প্রকাশিত হল - যা পরবর্তীতে গ্যামোর রসিকতাকে সত্যি প্রমানিত করে এখন 'আলফা-বেটা-গামা পেপার' নামেই বৈজ্ঞানিক মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত!

কিন্তু সেই পেপারে কি বলেছিলেন গ্যামো? গ্যামো ধারণা করেছিলেন যে, একটা উত্তপ্ত মহাবিস্ফোরনের মাধ্যমে যদি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে সেই ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তার কিছুটা 'সাক্ষর' তো এখনও বজায় থাকা উচিৎ। গ্যামো গণনা করে দেখালেন, সৃষ্টির আদিতে তেজস্ক্রিয়তার যে উদ্ভব হয়েছিল, মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে তার বর্ণালী হ্রাস পেয়ে এখন পরম শূন্য তাপমাত্রার উপরে ৫ ডিগ্রীর মত বেশী হওয়ার কথা। এই ব্যাপারটিকে বলে 'মহাজাগতিক পশ্চাদপট তেজস্ক্রিয়তা' (Cosmic background radiation)। মহাশুন্যে এই তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যাবে মাইক্রোওয়েভ আকারে। সহজ কথায় মনে করা যাক, বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির আদিতে ছিল একটা গরম মাইক্রোওয়েভ চুল্লী যা এখন ঠান্ডা হয়ে ৫ ডিগ্রী কেলভিনে এসে পৌঁছেছে। এই ব্যাপারটিই পরীক্ষায় ধরা পড়ল ১৯৬৪ সাল নাগাদ - আর্নো পেনজিয়াস আর রবার্ট উইলসনের পরীক্ষায়। ব্যকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন মেপে তারা গ্যামোর তত্ত্বের খুব কাছাকাছি ফলাফল পেলেন - পরম শুন্যের উপর প্রায় ৩ ডিগ্রী। এই আবিস্কারের জন্য পেনজিয়াস আর উইলসন নোবেল পুরস্কার পান ১৯৭৮ সালে - গ্যামোর মৃত্যুর ১০ বছর পর। নোবেল পুরস্কার 'মরণোত্তর' হিসেবে দেওয়ার কোন রীতি নাই। যদি থাকত, গ্যামোকে চোখ বন্ধ করে বোধহয় তখন নির্বাচিত করা হত -যিনি প্রায় একক প্রচেষ্টায় বিগ-ব্যাঙকে আজ বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বোধ হয় কিছু জিনিস এ পৃথিবীতে সব সময়ই থাকবে যা নোবেল পুরস্কারের চেয়েও বেশী দামী আর গুরুত্বপুর্ণ!

পেনজিয়াস আর উইলসনের বিখ্যাত cosmic microwave background radiation আবিস্কারের পর তিন দশকেরও বেশী সময় কেটে গেছে। এই তো মাত্র ক' বছর আগে -১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে নাসা তার গোদার্দ স্পেস ফ্লাইট সেন্টার থেকে Cosmic Background Explorer (COBE) নামে একটি উপগ্রহ মহাশুন্যে প্রেরণ করল। এবারে কিন্তু আর মান্ধাত্যার আমলের যন্ত্রপাতি নয়, বরং অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিখুত ভাবে ব্যকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের অস্তিত্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হল। ফলাফল কিন্তু পেনজিয়াস আর উইলসনের সাথে অনেকাংশে মিলে গেল (2.725 +/- 0.002 K) । গ্যামোর মহাবিস্ফোরণের ধারণা তাহলে সম্পুর্ণ সঠিকই ছিল!

৫ম পর্ব...